গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২৫ - ৩১ আগস্ট, ২০০৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

অবিরাম মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারই দায়ী

কেন্দ্রে সিপিএমের সমর্থন-নির্ভর ইউপিএ সরকারের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্ত নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার কালোবাজারি-মজুতদারি বন্ধ না করে গম, ডাল, চিনির দাম কমাবার অজুহাত দেখিয়ে এগুলির ঢালাও আমদানির অনুমতি দিয়েছে। কার স্বার্থে এই পদক্ষেপ? এর উদ্দেশ্য কি মূল্যবৃদ্ধি আটকানো?

সরকারি ভাষ্য ও বাস্তব সমস্যা

গত এক বছরে গমের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশ, ডালের দাম ৩০ শতাংশ, চিনির দাম প্রায় ১৫ শতাংশ (সূত্র ঃ ২৬ জুন, ২০০৬ সংবাদ প্রতিদিন)। প্রশ্ন হ'ল, এই মূল্যবৃদ্ধি কেন? সরকার বলছে — একদিকে কম উৎপাদন, তার সঙ্গে মজুতদারির জন্যই এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি এতই জটিল যে খাদ্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও। আপাতত চিনি ও ডাল রপ্তানি বন্ধ করা হয়েছে। সরকারি মজুত খাদ্যভাণ্ডারেও উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য নেই। সব চাইতে বেশি সমস্যা হয়েছে গমের ঘাটতি নিয়ে। সরকারি হুকুমে তাই গম আসবে সবচেয়ে বেশি। গত ১৯ জুন কৃষি ও ভোগ্যপণ্য বিষয়ক মন্ত্রকের সচিবস্তরের বৈঠকে স্থির হয়েছে আপাতত গম আমদানি করতে হবে ১০ লক্ষ টন, ডাল আমদানি হবে ৪৫ হাজার মেট্রিক টন। চিনি আনতে হবে ১০ লক্ষ টন (সূত্র ঃ বর্তমান ২৩ জুন ২০০৬)। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, ৩৫ লক্ষ টন গম আমদানি করা হবে। চিনি ও গম আমদানি করতে পারবে বেসরকারি সংস্থাও। ডাল আমদানি করা হবে সরকারি সংস্থা 'নাফেড'-এর মাধ্যমে। বলাবাহুল্য এই বিপুল গম আমদানি বিগত কয়েক দশকের মধ্যে নজিরবিহীন। আমদানির পক্ষে সরকারি যুক্তি হল — উৎপাদন কম, খাদ্য ভাণ্ডারে মজুত খাদ্যের ঘাটতি এবং মজুতদারির সম্মিলিত ফলেই এই মূল্যবৃদ্ধি। সরকারি এই ভাষ্য আদৌ সত্য কি না, এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধে খাদ্য আমদানির সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর তা বিচার করে দেখা দরকার। দেশের সাধারণ মানুষকে দু'বেলা পেটপুরে খাওয়ানোর জন্য সত্যই সরকার আদৌ আন্তরিক ও দায়বদ্ধ কি না, তাও এই নিরিখে যাচাই করে দেখা জরুরি কর্তব্য।

গম ও চিনি উৎপাদনের ঘাটতির মিথ্যা অজুহাত

আমরা প্রথমে দেখব উৎপাদনের চিত্রটা। গত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষে গমের উৎপাদন মোটামুটি স্থিতিশীল। উৎপাদনের পরিমাণ ৭ কোটি থেকে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টন। ২০০০-২০০১-এ এই পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। বর্তমান বছরে জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী ৭ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনের মতো উৎপাদন হতে পারে। গত বছর এই পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারি হিসাবেই গম উৎপাদনে অভাবিত

সাতের পাতায় দেখুন

ছ'দিন অনশনের পর রাজ্য সরকার দাবি মানতে বাধ্য হল
গণআন্দোলনের বিজয়

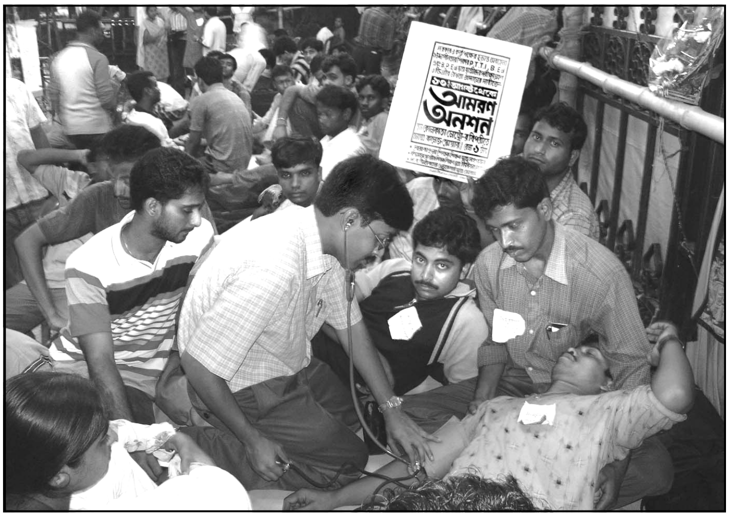

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং, বি এড এবং বি পি এডের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মতলায় ১৩ থেকে ১৮ আগস্ট একটানা ৬ দিন অনশন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে এই লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছেন যে, তাঁদের প্রাপ্ত শিক্ষণ সার্টিফিকেটকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা যে গভীর সমস্যায় পড়েছেন, সরকার তার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। ছবিতে ধর্মতলায় অনশনকারীদের শিবির।

ভিতরের পাতায়

- রাজ্যে রাজ্যে ৫ই আগস্ট
- মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শয়তানি
- অসংগঠিত শ্রমিকদের কর্মশালা
- কৃষি বিদ্যুৎ বিল বয়কটের ডাক
- ম্যালেরিয়া : ডুয়ার্সে আন্দোলন, বন্ধ
- ১৪ ডিসেম্বর শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকে সাধারণ ধর্মঘট

সাপ্তাহিক
গণদাবী'র
গ্রাহক হোন

গ্রাহক চাঁদা (সডাক)
বার্ষিক ৯১ টাকা
ষান্মাসিক ৪৬ টাকা

টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
গণদাবী
৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

ছাত্র রাজনীতিতে হিংসা আনল কারা

শিবপুর বি ই কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সৌমিক বসুর মর্মান্তিক মৃত্যু এ রাজ্যের ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ায় কিছু প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের বিভ্রান্তি। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ — রাজ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন ও সুস্থ পরিবেশ রক্ষার স্বার্থের সাথে সরাসরি জড়িত। তাই বিষয়টির গভীরে গিয়ে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

সৌমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসকদলের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই রাজ্য জুড়ে মিটিং-মিছিল করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, এই মৃত্যুর জন্য বি ই কলেজের ছাত্র সংসদে ক্ষমতাসীন 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসোলিডেশন' (আই সি) দায়ী, এমনকী এই ঘটনায় জড়িত দোষীদের শাস্তির দাবিতে তারা একদিন ছাত্র ধর্মঘটও ডেকেছিল। সমস্ত দিক থেকে তারা প্রমাণের চেষ্টা করেছে, যেন এর জন্য এস এফ আই-এর কোন দায় নেই। আবার, বিশেষ কিছু সংবাদমাধ্যম এই মৃত্যুর জন্য সাধারণভাবে ছাত্র রাজনীতিকেই দায়ী করে সস্তায় বাজার গরম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনিতেই সরকারি দলগুলির ঘৃণ্য ভূমিকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কে যে বিরূপতা, এমনকী ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে, এই প্রচার তাতেই ইন্ধন দিচ্ছে, যার পরিণাম ছাত্র সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই, বৃহত্তর জনসমাজের পক্ষেও বিপজ্জনক।

কী ঘটেছিল ৮ আগস্ট? আই সির প্রভাবাধীন ১১নং হোস্টেলের জুনিয়র ছাত্রদের উপর চড়াও হয় এস এফ আই-এর কিছু সিনিয়র ছাত্র এবং বহিরাগতরা। সেদিন ঐ হোস্টেলে ছাত্রদের মারধোর ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ঐ সময় কর্তৃপক্ষের গাড়ি আসতে দেখে হামলাকারীরা পালাতে থাকে। তখনই ঐ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। সৌমিক দোতলা থেকে একতলায় নর্দমায় পড়ে যায়। এস এফ আই-এর কর্মীরা তার দিকে ফিরেও তাকায়নি, আই সি'র ছাত্র কর্মীরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানেই ১২ আগস্ট তার মৃত্যু হয়। প্রশ্ন উঠেছে, সৌমিক নিজের হোস্টেল ছেড়ে ঐ হোস্টেলে গিয়েছিল কেন? কাদের প্ররোচনায়? সে স্বেচ্ছায় গিয়েছিল, নাকি এস এফ আই দাদাদের ধমকানিতে যেতে বাধ্য হয়েছিল, যেমন অন্যান্য কলেজে প্রতিদিন ঘটে চলেছে? সৌমিক নিজে পড়ে গিয়েছিল, নাকি তাকে অন্য কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল? কোন প্রশ্নেরই এখনও উত্তর হয়নি। এস এফ আই-এর পক্ষে অপ্রীতিকর এইসব প্রশ্ন চাপা দিতেই কি নেতারা অতি তৎপর হয়ে ধর্মঘট ডেকেছিলেন? প্রয়াত সৌমিক সম্পর্কে এস এফ আই নেতাদের স্ববিরোধী বিবৃতিগুলিও লক্ষণীয়। ঘটনার পরপরই

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্দামানে ৫ই আগস্ট উদ্‌যাপিত

লিট্‌ল আন্দামানের রামকৃষ্ণপুর কমিউনিটি হলে ৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ প্রধান শিক্ষক নারায়ণ মণ্ডল, প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড ডাঃ অশোক সামন্ত।

দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ১৩০০ কিমি দূরে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সাত-আট ঘণ্টার জাহাজপথে লিটল আন্দামান। সেখানকার জেটি থেকে ১৬ কিমি দূরে রামকৃষ্ণপুর। জীবিকার সন্ধানে মূল ভূখণ্ড থেকে বহু গরিব মানুষ এখানে এসেছেন আর আছেন কিছু স্থায়ী বাসিন্দা।

দলের কর্মী-সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। প্রধান বক্তা কমরেড ডাঃ অশোক সামন্ত, দলগঠনে কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্য সংগ্রামের দিকগুলি তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে লিট্‌ল আন্দামানের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাড়ে চার লক্ষ অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও এখানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ খুবই কম। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ সত্ত্বেও শিল্প কারখানার যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি নেই জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা। স্থায়ী চাকরি বা জীবিকার সুযোগ কম। তিনি বলেন, আন্দামানবাসীদের জীবনের এসব মূল সমস্যা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। মূল ভূখণ্ডের মানুষের জীবনের সমস্যাও এগুলি। প্রসঙ্গত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাংস্কৃতিক সঙ্কট নিয়েও কমরেড সামন্ত এস ইউ সি আই-এর বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি আরও দেখান, উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা, ব্লু-ফিল্ম, সিডি-র ব্যাপক প্রচার দ্বীপভূমির সুস্থ সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করছে। এ সমস্যাও বিচ্ছিন্ন নয়। মূল ভূখণ্ডেও এই সমস্যা তীব্র; এর মূলে রয়েছে ভারতবর্ষের ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির আধারে বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে পারলেই একমাত্র এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি সম্ভব। এই গণমুক্তি অর্জনের একমাত্র ও সঠিক পথ দেখিয়েছেন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও বলেন, শাসক-শোষকরা সুচতুর চক্রান্তে এন জি ও-র মাধ্যমে জনগণকে পাইয়ে দেবার মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক মানকে ধ্বংস করছে — এটি বিগত সুনামীর আর একটি বেদনাময় দিক। এই আক্রমণ সুস্থ রাজনীতির বিকাশের পথে মারাত্মক বাধা। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভা শেষ হয়।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

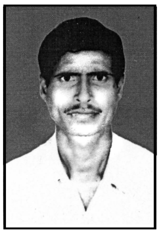

মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর আঞ্চলিক কমিটির কর্মী, দলের আবেদনকারী সদস্য এবং এ আই ডি ওয়াই ও'র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ওয়াজেদ আলি গত ১৪ আগস্ট সকালে কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবসে কলকাতার সমাবেশ থেকে ফেরার পথে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে বাস থেকে নামার সময় কমরেড ওয়াজেদ মাটিতে পড়ে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে যান। অন্যান্য কমরেডরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ এন আর এস হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে এক্সরে ও সিটি স্ক্যান করার পর ধরা পড়ে যে, তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত লেগে রক্তক্ষরণ হয়েছে। চিকিৎসকরা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার দরকার বলে জানান এবং তার ব্যবস্থাদিও শুরু হয়। কিন্তু অস্ত্রোপচারের আগেই হঠাৎ ১৪ আগস্ট সকালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড ওয়াজেদের মৃত্যুসংবাদে মুর্শিদাবাদ জেলায় দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঐ দিনই বহরমপুরে পার্টিকর্মীদের এক সভায় প্রয়াত কমরেডের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কমরেড ওয়াজেদ তাঁর গ্রাম টেঁকারাইপুরে নিয়মিত 'গণদাবী' পড়ার মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই-এর চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং আকৃষ্ট হয়ে দলের কাজ শুরু করেন। সংসারের অভাব ও বাধাবিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে দলের একজন সর্বক্ষণের কর্মীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি ইসলামপুর আঞ্চলিক পার্টি কার্যালয়েই থাকতেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তিনি সর্বদা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতেন। দুর্ঘটনায় তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও গণআন্দোলন একজন সৈনিককে হারাল।

কমরেড ওয়াজেদ আলি লাল সেলাম

ডুয়ার্সে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু

আন্দোলন ● বন্‌ধ ● ক্ষতিপূরণ ঘোষিত

ডুয়ার্সে দেড়-দু'মাস ধরে ম্যালেরিয়ার তীব্র প্রকোপে একের পর এক মৃত্যু হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেলেও সরকার উদাসীন। স্বাস্থ্যদপ্তর নিষ্ক্রিয়। সাধারণ মানুষ উপযুক্ত চিকিৎসার দাবি জানালেও এই সরকারের কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙেনি। ১৭ জুলাই আলিপুরদুয়ারের মানুষ সন্ধ্যা ৭টায় সমস্ত প্রকার আলো নিভিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে যে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছিল, সরকার বিবেকহীন না হলে তার মর্মার্থ বুঝতে পারত যে, এ ছিল জনজীবনে গভীর অন্ধকারের বিরুদ্ধেই জনপ্রতিবাদ। সরকার গণমুখী হলে জনগণের দাবির মূল্য দিত। রাজ্য সরকার তা দেয়নি। ফলে ২২ জুলাই এস ইউ সি আই আলিপুরদুয়ার চৌপথীতে পথ অবরোধে সামিল হ'ল। সরকার জবাব দিল পুলিশের লাঠি দিয়ে, ব্যাপক জখম হল, গ্রেপ্তার ২৫। এদিকে ম্যালেরিয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অগত্যা ২৪ জুলাই আলিপুরদুয়ারবাসী বনধে সামিল হয়। এই বনধ দেখিয়ে দিল, রাজ্য সরকারই শুধু অপদার্থ নয়, শরিকদলগুলিও জনবিরোধী চিন্তায় আক্রান্ত। "সিপিএম নেতা সুনীল ঘোষ বলেন, ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা যেকে আক্রান্তের সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। বর্তমানে আলিপুরদুয়ারে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে" (উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৩-৭-০৬)। সিপিএম, আর এস পি এই বনধের বিরুদ্ধে নামে। অন্যদিকে বনধের সমর্থনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক বিবৃতিতে বলেন, "এই সরকার নাগরিকদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতে পারে না, অথচ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর দমনপীড়ন চালাতে খুবই তৎপর।...আলিপুরদুয়ারবাসীর নিকট এই হরতালকে সফল করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।" বনধে ব্যাপক সাড়া মেলে। শহরের মাধবমোড় ও চৌপথীতে পুলিশ এস ইউ সি আই সমর্থকদের উপর লাঠি চালায়। মাধবমোড়ে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশকে বাধা দিলে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। ৩৭ জন এস ইউ সি আই সমর্থককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধারাবাহিক আন্দোলনের এই চাপ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আলিপুরদুয়ারে আসতে বাধ্য করে। ৮ আগস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে এলে এস ইউ সি আই কর্মীরা মন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখায়। ঝাঁপিড়ে পড়ে বিশাল পুলিশবাহিনী। জখম হয় ১৫ জন। গ্রেপ্তার তিন। ৯ আগস্ট সংবাদে প্রকাশ, "১১৮ জনের মৃত্যুর পরে নিজের দফতরের ব্যর্থতার কথা কবুল করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী... (তিনি) বলেন, প্রতি বছর ম্যালেরিয়া হলেও তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। এবার ঠিকমতো তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। ঘরে বসে বৈঠক করলেই ম্যালেরিয়া রোধ করা যায় না" (আনন্দবাজার ৯-৮-০৬)। আন্দোলনের চাপে ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতা চাপা দেওয়া গেল না বলেই বাধ্য হয়েই মন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তি। কোচবিহার সার্কিট হাউসে বসে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সাথে বৈঠকের পর মৃতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করেন। আন্দোলনের এটাও এক জয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে অসংগঠিত শ্রমিক কর্মশালা

মুটিয়া মজদুর সহ সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা, বার্ধক্যভাতা, ন্যায্য মজুরি, পিএফ, বিপিএল কার্ড প্রদান প্রভৃতি দাবিতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলে গত ১১ আগস্ট এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় মুটিয়াশ্রমিক, রিক্সাশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রস্তাবের উপর কমরেডস্ ভোঁদু বাউরী, বাসুদেব বাউরী, অবনী বাউরী, জয়দেব রজক, বুধন সহিস বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বক্তব্য এবং সংযোজনী রাখা হয়। এরপর সভার প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "রঘুনাথপুরের মুটিয়া শ্রমিকরা যেভাবে তাদের পাঁচ বছরের বকেয়া সহ মজুরিবৃদ্ধির জন্য মালিক ও সরকারকে একযোগে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে নোটিশ দিয়েছে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু শ্রমিকদের আজকের দিনে শুধু মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলন করে মুক্তি আসবে না। এজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে সকল অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লাগাতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ভিতরে রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া দরকার।" তিনি প্রতিটি শ্রমিককে নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সভাপতি কমরেড ডি কে মুখার্জী, রাজ্য সহসভাপতি ও জেলা সম্পাদক কমরেড এম কে সিনহা এবং সভার সভাপতি বিশিষ্ট খনিশ্রমিক নেতা এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এস এস ঠাকুর। সমগ্র কর্মশালাটি পরিচালনা করেন অসংগঠিত শ্রমিকদের নেতা এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বুলু সিনহা। কর্মশালায় উপস্থিত দেড়শতাধিক শ্রমিক অত্যন্ত ধৈর্য এবং মনোযোগ সহকারে নেতাদের বক্তব্য শোনেন।

শহীদ বেদী শুধু ইঁটের পর ইঁট গাঁথা নয়, লড়াইয়ের প্রেরণা — শহীদ নহিরুদ্দিনের স্মরণসভায় প্রাণরঞ্জন চৌধুরী

১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম শহীদ নহিরুদ্দিনের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সর্বত্র শহীদ বেদীস্থাপন করে মাল্যদান ও পথসভার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের দাবি তোলা হয়। বিজ্ঞানসম্মত মাস্টারপ্ল্যানের ভিত্তিতে বন্যানিয়ন্ত্রণ, সুখা মরশুমে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধ এবং অর্থ নয়ছয় ও দুর্নীতিরোধ করার দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি পুনরায় সোচ্চার হয়।

এদিন মূল অনুষ্ঠানটি হয় ভগবানগোলার খড়িবোনায়। নহিরুদ্দিন স্মরণে স্থায়ী শহীদ বেদীর আবরণ উন্মোচন করেন কমিটির সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন জেলা যুগ্ম সম্পাদক সাধন রায়, কৃষক নেতা সাজেম আলি, অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু প্রমুখ। পদ্মার পাড়ে খড়িবোনা স্কুল ময়দানের সভায় এদিন সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আন্দোলন কমিটির প্রবীণ সভাপতি আব্দুল গফুর রহমান। সহস্র মানুষের উপস্থিতিতে জেলা সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'শহীদ নহিরুদ্দিন আমাদের মনের মণিকোঠায় গাঁথা থাকবে। জনজীবনের সমস্যা নিয়ে যাঁরা বিভিন্ন আন্দোলনে নির্যাতিত এবং শহীদ হয়েছেন তাঁরাই আমাদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন'। তিনি আরও বলেন, 'শহীদ বেদী শুধু ইঁটের পর ইঁট গাঁথা নয়। যে নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তা পরবর্তী প্রজন্মকে প্রেরণা দিয়ে যাবে।' জেলা যুগ্ম সম্পাদক সাধন রায় আন্দোলনের পটভূমি স্মরণ করিয়ে দেন। পুলিশের গুলিতে সাধারণ খেতমজুর নহিরুদ্দিন যে আত্মবলিদান করে চিরভাস্বর হয়ে রইল সেকথাও স্মরণ করান। নেত্রী খাদিজা বানু নহিরুদ্দিনের অপূরিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ধুলিয়ান থেকে জলঙ্গি সর্বত্র ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নন্দদুলাল সরকার, আবুল কালাম আজাদ, কমলকান্তি ঘোষ প্রমুখ। সভাপতি আব্দুল গফুর বলেন, নহিরুদ্দিন আমাদের পথ দেখিয়েছে। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

ওড়িশা, আসাম, দিল্লি, হরিয়ানায় ৫ই আগস্ট পালিত

ওড়িশা

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ই আগস্ট কটকের জনসভায় প্রবল বৃষ্টি ও বন্যাপরিস্থিতির মধ্যেও পুরী, কটক জেলা ছাড়াও ময়ূরভঞ্জ জেলার একটি অংশ, ভদ্রক ও কেওনঝাড় জেলা থেকে পার্টি কর্মী, সমর্থক, দরদী ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি ঘটেছিল। সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য, জাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জগবন্ধু বড়াল। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত অসুস্থতার কারণে বক্তব্য রাখতে পারেননি, তাঁর লিখিত ভাষণ সভায় পাঠ করা হয়।

কটক ছাড়াও অনগুল, যশিপুর, রাউরকেল্লা, ভোগরাই, ভাণ্ডারিপোখরি, সালিনিয়া, জগৎসিংপুর, কোরাপুট ও অন্যান্য স্থানে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ আগস্ট অনগুলের সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড তাপস দত্ত, সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ধূর্জটি দাস।

এখানে আমরা কটকের সভায় পাঠ করা কমরেড তাপস দত্তের লিখিত ভাষণের কিছু অংশ প্রকাশ করছি।

তিনি বলেন, আপনারা জানেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ হচ্ছেন আমাদের প্রিয় দল, ভারতের মাটিতে একমাত্র সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা। কঠিন ও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি এই পার্টি গড়ে তোলেন।... ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরে একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে এই পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। নবজাতক এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড শিবদাস ঘোষ। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কোনও পার্টি সংবিধান গ্রহণ করা হয়নি। উদ্দেশ্য ছিল, দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত করে এবং জনগণের মধ্যে থেকে জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং সাংবিধানিক নীতিনিয়মগুলি অভ্যাসরূপে চর্চার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ও

কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড তাপস দত্ত

ক্রমান্বয়ে বিকশিত করা। এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম। এই কষ্টসাধ্য দীর্ঘসংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই পার্টি সংবিধান বিকশিত হয় ও ১৯৮৮ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে তা গৃহীত হয়।

...প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই আমাদের পার্টি আদর্শগত সংগ্রামের উপর যেমন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, পাশাপাশি কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে, বহু বাধাবিপত্তি মোকাবিলা করে গণসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করেছে। আদর্শগতভাবে যোগ্য অনেক নেতাকেই কমরেড ঘোষ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণআন্দোলন ও পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কমরেড প্রীতীশ চন্দ ও কমরেড হীরেন সরকারকে তিনি বিহারের খনিঅঞ্চল ও ধানবাদের কয়লাখনি অঞ্চলে পাঠান শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য। মুসাবনি তাম্র খনিতে একটি ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শ্রমিকদের বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়। ওড়িশার তদানীন্তন বামনদা রাজ্যে যখন প্রজাবিদ্রোহ চলছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজে সেখানে আসেন। বামনদায় পৌঁছানো মাত্রই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীও বহুবার ওড়িশায় এসেছেন। তাঁর উদ্যোগেই ওড়িয়া ভাষায় পার্টির মুখপত্র "সর্বহারা" প্রথম প্রকাশিত হয়। গগন পট্টনায়েককে নিয়ে তিনি টমকা খনিতে শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে ভাণ্ডারিপোখরির কাছে আখুয়াপদায় একটি স্টাডি ক্লাস পরিচালনার জন্য আমাকে পাঠানো হয়। আমি তখন ওড়িয়া ভাষা জানতাম না, আমি কী বলব, কীভাবে ব্যাখ্যা করব? কমরেড শিবদাস ঘোষ আমায় বললেন, "বহু বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই, আপনি ওদের কেবল বিপ্লবের অপরিহার্যতা বিষয়ে প্রত্যয় দেবেন।" আমি বুঝলাম, বিপ্লবের কথা নিয়ে যাওয়াই আসল কাজ, সব কাজের মর্মকথা। ১৯৫৬ সালে আমাকে স্থায়ীভাবে রাউরকেল্লায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বহু ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলন এই রাজ্যে সংগঠিত হয়েছে। রাজ্যের প্রায় সকল প্রধান শিল্পক্ষেত্রেই শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, বহু গণসংগঠনও গড়ে উঠেছে। কটক, জাজপুর, অনগুল, সোনপুর, কোরাপুট, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝাড়ে, বালেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং ওড়িশার অন্যান্য অঞ্চলে পার্টি সংগঠন গড়ে উঠেছে। এ আই ডি এস ও'র বহু নেতা রাউরকেল্লা থেকে যুক্ত হয়েছে, তারা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়েছে। ১৯৭৪ সালে এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সম্মেলন কটকে অনুষ্ঠিত হয়, কমরেড শিবদাস ঘোষ স্বয়ং সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন।

...সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই করে আসছে। শ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলন ছাড়াও আমাদের পার্টি বহু জঙ্গি কৃষক ও আদিবাসী আন্দোলন পরিচালনা করেছে। দুরান্তের আদিবাসী গ্রামগুলির জনগণ আজও সেই আন্দোলনগুলির কথা স্মরণ করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজে বহুবার রাউরকেল্লায় এসেছেন, বহু রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেছেন, এবং বিশাল বিশাল জনসভায় ভাষণও দিয়েছেন। ঐ প্রক্রিয়াতেই ওড়িশায় এস ইউ সি আই গড়ে উঠেছে।

...কোনও নেতাই আকাশ থেকে পড়ে না। সঠিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একজন নেতায় পরিণত হন। বিপ্লবের সঠিক ধারণাকে উপলব্ধি করতে না পারলে, জনগণের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও সঠিকভাবে তা প্রয়োগ করতে না পারলে বিপ্লব করা যায় না। ব্যক্তিগত জীবনে তা অর্জন করা অবশ্যপ্রয়োজন। কিছু কমরেড মনে করেন, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাগুলো যেহেতু সাধারণ, তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই সেগুলি নিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। একথা ভেবে নিয়ে তাঁরা সমস্যার নিরসন করে নেন না। এটা ঠিক নয়। একটা সমস্যা অন্য হাজারো সমস্যার জন্ম দেয়। তাই নিজেদের সমস্যা নিয়ে চিন্তায় না থেকে, তাদের উচিত পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার নিরসন করে নেওয়া।

...সমস্যা আসতেই থাকবে। কিন্তু একজন বিপ্লবীকে বিপ্লবের জন্য কাজ করে যেতেই হবে, এটাই তার জীবনদর্শন, এটাই তার আদর্শ। সে কখনও বিপ্লবের ময়দান পরিত্যাগ করতে পারেনা। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, বিপ্লবী জীবনের থেকে মহৎ জীবন, তার থেকে বেশি মূল্যবান সম্পদ আর কিছু নেই। একটা বিপ্লবী চরিত্রই হচ্ছে মহত্ত্ম। এই সত্য খুবই অল্প বয়সে কমরেড শিবদাস ঘোষ উপলব্ধি করেছিলেন এবং সর্বস্বপণ করে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, আসুন আমরা শপথ করি, বিপ্লবের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করার জন্য বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে আমরা আপসহীনভাবে আত্মনিয়োগ করব।

...কমরেড শিবদাস ঘোষ আর নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর আদর্শ ও তাঁর পার্টি এস ইউ সি আই-এর মধ্যে তিনি জীবিত আছেন। তাঁর চিন্তাধারা আজ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি যে শিক্ষা ও পথনির্দেশ রেখে গেছেন, সেটই আমাদের বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আসাম

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৫ই আগস্ট গৌহাটির জেলা গ্রন্থাগার ভবনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য, প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড সিদ্ধেশ্বর শর্মা।

প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ ভাষণে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধিকে আরও সমৃদ্ধ করতে এবং ভারতের পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ কী গভীর ও অন্তর্ভেদী তত্ত্বগত অবদান রেখেছেন, তা ব্যাখ্যা করেন।

আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড

গৌহাটিতে ভাষণরত কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

ভট্টাচার্য প্রথমেই দেখান যে, আসামের অনগ্রসরতা ও চূড়ান্ত পশ্চাৎপদতাকে দূর করার জন্য সরকারি তরফে কোনও প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ না থাকার ফলে জনজীবনের অবস্থা ক্রমেই আরও শোচনীয় হচ্ছে। অথচ জনজীবনের এই জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর সমাধান দাবি করে জনগণের কোনও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা যাচ্ছে না। কারণ শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের সেবাদাস দলগুলির মদতে বিভাজনবাদী, বিভেদকামী ও পৃথকতাবাদী শক্তিগুলি জনগণের ন্যায্য দাবিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে ওঠার মূলেই আঘাত করেছে শুধু নয়, এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে এক অখণ্ড রাজ্য হিসাবে আসামের বাস্তব অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কমরেড ভট্টাচার্য আসামের জনগণকে সকল প্রকার বিভাজনবাদী ও পৃথকতাবাদী চিন্তার নিকৃষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এমন এক বৈজ্ঞানিক দর্শন, যাকে নিষ্ঠার সাথে অনুশীলনের মধ্য দিয়েই একমাত্র জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কার্যকরী মোকাবিলা সম্ভব।

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্কট প্রসঙ্গে আলোচনায় কমরেড ভট্টাচার্য দেখান, কীভাবে বিশ্বব্যাপী নানা রঙের আধুনিক শোধনবাদীদের কৃতকর্মে সাম্যবাদী আন্দোলনে সঙ্কট ত্বরান্বিত হয়েছে, যার পরিণামে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনসহ অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশেই আবার

চারের পাতায় দেখুন

আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫ই আগস্ট পালিত

আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে ৫ই আগস্ট বিকালে দলীয় বন্দি কমরেডস্‌ এবং সাধারণ বন্দিসহ প্রায় দেড় শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণদিবস উপলক্ষ্যে এক সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় কমরেড অশোক চক্রবর্তীর প্রস্তাবে এবং কমরেড বাঁশিনাথ গায়েনের সমর্থনে পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণব চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

সভাপতি কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন যে, উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে নিজেকে একজন যোগ্য পার্টি কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে পারলেই ৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।

সভার মূল বক্তা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, মিথ্যা মামলায় আটক জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলেন, দেশ যখন স্বাধীন হতে চলেছে তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এই স্বাধীনতায় দেশের মানুষের মুক্তি আসবে না। সেই কিশোর বয়সে এই উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি কল্পনাতীত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, বিরোধীদের হাজার ঠাট্টাবিদ্রূপ উপেক্ষা করে কয়েকজন সহযোগী কমরেডকে সঙ্গে নিয়ে একটা সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তুলেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, আমি যা সত্য বলে বুঝেছি, তা কোনভাবেই ত্যাগ করতে পারি না। আর সেই সত্যের উপর ভিত্তি করে আমি অন্তত একটা-দুটো ইট গেঁথে দিয়ে যাবো, যাকে ভিত্তি করে একদিন বিপ্লবের ইমারত গড়ে উঠবে।

আজ স্বাধীনতার ৬০ বছর পরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সুপরিকল্পিতভাবে একটার পর একটা জনস্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের জনগণের উপর নির্মমভাবে শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র আমাদের দল জনস্বার্থে সর্বশক্তি দিয়ে সারাদেশে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলছে।

তিনি উপস্থিত দলের কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, এই বন্দিজীবনে আমাদের নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের দলের বেশ কিছু কর্মী-নেতা দলের আদর্শকে যতটুকু নিয়ে চলবার চেষ্টা করছেন, তা অন্যান্য সাধারণ বন্দিদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন, আমি দলের সমস্ত বন্দি কমরেডদের কাছে আবেদন করি, আসুন আমরা সকলে মিলে দলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সংগ্রামকে তীব্রতর করি।

রাজ্যে রাজ্যে ৫ আগস্ট পালিত

তিনের পাতার পর

পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় ফিরে আসতে পেরেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে, প্রথমত, জ্ঞানজগতের ক্ষেত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, আদর্শ ও দর্শনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেকি মার্কসবাদী ও বিশ্বাসঘাতক শোধনবাদীরা ঠিক কী ধরনের ও কতটা গভীর ক্ষয় ঘটিয়েছে সেটা নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের যাবতীয় আত্মসন্তুষ্টি ঝেড়ে ফেলতে হবে, গতানুগতিক চিন্তা ও কর্মধারা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নততর উপলব্ধির ভিত্তিতে নতুন সাম্যবাদী আন্দোলনের জন্ম দিতে হবে। সর্বোপরি সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের বিলীন হওয়ার পথে যে ব্যক্তিবাদ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দূর করে এই সংগ্রামে আরও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটাই বর্তমান সময়ে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামের সবচেয়ে প্রধান দিক, যে-কথা কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার আমাদের বলেছেন।

সভায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করা হয় যে, আলফা আন্দোলনের নেতাদের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হোক। এটা যে আসামের জনগণের একটা আন্তরিক আকাঙক্ষা, সেকথা যেন কেন্দ্রীয় সরকার অনুভব করে এবং কোন না কোন অজুহাত তুলে আলোচনায় বাধা সৃষ্টি না করে। প্রস্তাবে আলফা নেতৃত্বের প্রতিও আবেদনে বলা হয়, যত শীঘ্র সম্ভব আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসায় পৌঁছানো যাতে সম্ভব হয়, সেটা তারা যেন খেয়ালে রাখেন, কারণ তার উপরই নির্ভর করছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ আসামে কত দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যাবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে লেবাননে মার্কিন-ইজরায়েল নৃশংস হানাদারিকে ধিক্কার জানিয়ে লেবানন ও প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাকামী জনগণের পক্ষে ভারতবাসীকে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

সভার শুরুতে আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে, আসামের বুকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজনের দিকগুলি তুলে ধরেন।

সভাপতির ভাষণে কমরেড সিদ্ধেশ্বর শর্মা, ভারতের বিপ্লবের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করার জন্য আসামের জনগণকে আবেদন করেন।

দিল্লি, হরিয়ানা

দিল্লিতে ৫ই আগস্ট এবং হরিয়ানায় ভিওয়ানিতে ৬ই আগস্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লির সভায় সভাপতিত্ব করেন দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড এ কে মজুমদার, হরিয়ানার সভায় সভাপতিত্ব করেন হরিয়ানা রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যবান। দুটি সভাতেই মূল বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। এছাড়াও দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামল এবং হরিয়ানা রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড রামফল বক্তব্য রাখেন।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, ৫ই আগস্ট হচ্ছে এমন একটি দিন, যাকে সামনে রেখে ভারতের বিপ্লবীরা নতুন করে শপথ নেয় — কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুসরণ করে এদেশের শ্রমজীবী জনগণকে পুঁজিবাদী শোষণ জুলুমের জোয়াল থেকে আমরা মুক্ত করব, সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন সহ অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটার ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, সিপিএম-সিপিআই-এর মতো চূড়ান্ত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলির কৃতকর্ম মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে, তার থেকে মানুষকে যদি মুক্ত করা যায়, তবেই একমাত্র এদেশে বিপ্লব সফল করা সম্ভব।

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, প্রকৃতিজগতের মতো সমাজও যেহেতু নিয়মের ভিত্তিতে চলে, সেহেতু সমাজপরিবর্তনের নিয়মগুলিকে জানা ও উপলব্ধি করার দ্বারাই একমাত্র আমরা বাস্তব পরিস্থিতির উপর ক্রিয়া করতে পারব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদই এই নিয়মগুলিকে উন্মোচিত করেছে, কীভাবে তা জানব ও সেই অনুযায়ী কাজ করব, সেই শিক্ষাও দিয়েছে।

লেনিন দেখিয়েছেন, প্রতিটি বিপ্লবের মুখ্য কাজ হচ্ছে, শাসকশ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নেওয়া। রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এস ইউ সি আই সামগ্রিকভাবে পুঁজিপতিশ্রেণী, তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে। সিপিএম-সিপিআই-এর মতো দলগুলো বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির বিরুদ্ধে কখনও কিছু গরম কথা বলতে পারে, কিন্তু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনা। পুঁজিবাদের

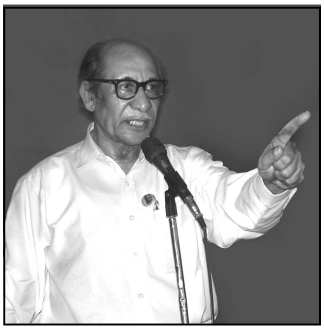

হরিয়ানায় ভাষণরত কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত একটা নতুন ব্যবস্থা, নতুন সভ্যতা, একটা নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। যদিও ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের সময় পুঁজিবাদের প্রগতিশীল, এমনকী বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল, কিন্তু বিকাশের পথে পুঁজিবাদ আজ চরম প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ, ধনকুবের গোষ্ঠী এবং শিল্পপুঁজি ও ব্যাঙ্কপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নীপুঁজির জন্ম দেওয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এবং যাবতীয় প্রগতিশীল ভূমিকা হারায়। ইতিহাসের নিয়মেই পুঁজিবাদ আজ ক্ষয়িষ্ণু মরণোন্মুখ। কিন্তু তা আপনাআপনি ধ্বংস হয়ে যাবে না। প্রতিটি সমাজ পরিবর্তনেই মানুষের সচেতন ভূমিকা প্রয়োজন। আজ বিপ্লবের বস্তুগত জমি তৈরি, ভাবগত দিকটাই আজও প্রস্তুত নয়।

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হবে না, বিপ্লব করার মতো শক্তিধর একটি বিপ্লবী পার্টির অস্তিত্ব ছাড়াও বিপ্লব হবে না। এই ঐতিহাসিক সত্যের উপলব্ধির ভিত্তিতেই কমরেড শিবদাস ঘোষ, এদেশের মাটিতে এ যুগে পার্টি গঠনের লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব ও পার্টির স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এক উন্নত ও মহৎ কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী হন।

বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের আশায় ও সমাজতন্ত্রের পুনরভ্যুত্থানে বাধা সৃষ্টি করতে বিশ্বায়নের জনবিরোধী কার্যক্রম নিয়ে দেশে দেশে মেহনতী জনগণের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাচ্ছে। পাশাপাশি, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু করার দ্বারা শাসকশ্রেণী দুটি বুর্জোয়া পার্টি বা জোটকে — যেমন কংগ্রেস অথবা বিজেপিকে মদত দিয়ে কখনও একটি, কখনও অপরটিকে সরকারে রেখে পুঁজির শাসন শোষণ সফলতার সাথে চালিয়ে যেতে পারছে। মেকি মার্কসবাদী সিপিএম-সিপিআই সহ সমস্ত প্রধান পার্লামেন্টারি দল ও তাদের সরকারগুলো শাসকশ্রেণীর জনবিরোধী নীতিগুলোই অনুসরণ করছে। বামপন্থী নামের আড়ালে সিপিএম-সিপিআই সবচেয়ে জঘন্য ভূমিকা পালন করছে।

আক্রমণ কেবল আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল স্তরে এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করা দরকার। যা ছাড়া ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এজন্য আদর্শগতভাবে বলীয়ান হতেই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলি আমাদের জানতে ও উপলব্ধি করতে হবে।

বিপ্লবী তত্ত্ব অনুসরণ করে লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লব সফল করেন। লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে, ভারতের মাটিতে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি তৈরি করতে কমরেড ঘোষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কমরেড ঘোষের মৃত্যুর পর সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের দিয়েছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। এখন জনগণকেই এস ইউ সি আই-এর বিপ্লবী নেতৃত্বকে চিনে নিয়ে তাকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসতে হবে।

শ্রমিকদের জাতীয় কনভেনশনে দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

১৪ ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক

গোটা দেশজুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর উপর সর্বব্যাপী যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে এসেছে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, সিটু, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, টি ইউ সি সি, এ আই সি সি টি ইউ এবং ইউ টি ইউ সি-র মতো কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে গঠিত জাতীয় স্পনসরিং কমিটির ডাকে গত ২৫ জুলাই দিল্লির মবলঙ্কর হলে একটি জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, সিটুর কমরেড জীবন রায়, এ আই টি ইউ সি-র কমরেড অমরজিৎ কাউর সহ ১৭ জনের সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। বিরাট সংখ্যায় শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিনিধিরা এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন।

সভার অন্যতম বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, বিশ্বায়নের নীতি ও কার্যকলাপে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে চাকরির স্থায়িত্ব বলে কিছু থাকছে না। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিষয়গুলি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। যে সমস্ত ছোট ও মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, সেগুলিও আজ বিদেশি পুঁজির অবাধ বিনিয়োগের পরিণতিতে ধুঁকছে। এসবের বিরুদ্ধে আজ ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক লড়াই চাই। তিনি বলেন, শত্রু-মিত্রের সঠিক ধারণা গড়ে তুলে, তার ভিত্তিতেই এই লড়াই পরিচালনা করতে হবে। সভার অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিটু নেতা এম কে পান্ধে, এ আই টি ইউ সি নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত, এইচ এম এস নেতা থম্পন থমাস, ইউ টি ইউ সি নেতা অবনী রায়, এ আই সি সি টি ইউ নেতা স্বপন মুখার্জী প্রমুখ।

পুঁজির শোষণে জর্জরিত শিল্প ও কৃষিশ্রমিকদের জীবন-জীবিকার প্রধান সমস্যাগুলির প্রতিকারে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কনভেনশনের সর্বসম্মত ঘোষণাপত্রে বলা হয়, ইউ পি এ সরকার দু'বছর ক্ষমতায় থেকে 'সংস্কারে'র নামে ধনিকশ্রেণীকে মদত দিয়ে জনগণের ঘাড়ে যাবতীয় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। অনাহারে মৃত্যু বাড়ছে। জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হচ্ছে না। বিদেশি পুঁজির অবাধ বিনিয়োগের ফলে ছোট ও মাঝারি শিল্প মার খাচ্ছে। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। লাভজনক সরকারি সংস্থা বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিকা কর্মচারী ও আউটসোর্সিং ব্যাপকহারে বাড়ছে। শ্রমআইন লঙঘন করে শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জাতীয় কনভেনশন থেকে শ্রমিক-কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ১৬ দফা দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ১৪ ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলি সফল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঃ (ক) ১৬ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর সমস্ত রাজ্যে রাজ্যভিত্তিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক কনভেনশন করা হবে; (খ) সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ২০ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে জাতীয় দিবস পালন করা হবে; (গ) ২৯ নভেম্বর যুক্তভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল মন্ত্রক বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে মালিকদের লাভের লক্ষ্যে একদিকে কর্মীদের উপর শ্রমের বোঝা চাপানো ও অন্যদিকে হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতি গ্রহণ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই কনভেনশনে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত মন্ত্রীদের একটি গ্রুপ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমআইন পরিবর্তনের যে সুপারিশ করেছে, এই প্রস্তাবে তা বাতিল করার জন্য ইউ পি এ সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেতৃত্ব ১০ই আগস্ট এক যুক্ত সভায় বসে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঃ (১) আরও ব্যাপক জনগণের মধ্যে কর্মসূচিগুলি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব-মহিলা-শিক্ষক-কৃষক সংগঠনকে নিয়ে গঠিত এন পি এম ও (ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশন) বা জাতীয় মঞ্চের নামেই কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হবে, (২) ৪ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে রাজ্য কনভেনশন হবে, (৩) ২০ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ-এ রাজ্যভিত্তিক সমাবেশ হবে, (৪) প্রতিটি জেলায় জেলাভিত্তিক কনভেনশন ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

লেবাননে ইজরায়েলি আক্রমণ

সাম্রাজ্যবাদী শয়তানির শিকার মধ্যপ্রাচ্য

গত ১৩ জুলাই থেকে দীর্ঘ এক মাসব্যাপী মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের হানাদারি, বিমান আক্রমণ, বেপরোয়া বোমাবর্ষণ ও নৃশংস গণহত্যায় ইতিমধ্যেই লেবাননের ঘরছাড়া উদ্বাস্তুর পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ, মৃতের সংখ্যা সরকারি ভাবেই হাজার ছাড়িয়েছে (১৪ আগস্ট যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত)। এদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু-বৃদ্ধ-মহিলা সহ নিরীহ অসামরিক জনগণ। সমগ্র দক্ষিণ লেবানন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। হাসপাতালগুলিতে স্থানাভাব। লক্ষ লক্ষ মানুষ একটু নিরাপত্তার খোঁজে বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে ছুটে চলেছেন অনির্দিষ্ট পথে। ইজরায়েলি বাহিনীর হেলিকপ্টার গানশিপ এ'কদিন টানা তাড়া করে ফিরেছে সন্ত্রস্ত সাধারণ নাগরিকদের, নির্বিচারে তাদের উপর গুলি চালিয়েছে, বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যাওয়া নাগরিকদের গাড়ির কনভয়ের উপর। এক্ষেত্রে নিরীহ মানুষ বোঝানোর জন্য উত্তোলিত সাদা পতাকা বা রেডক্রশের চিহ্ন — মানা হয়নি কোনও কিছুই। ফলে মৃত ও আহতের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে ক্রমাগত।

এই আক্রমণের পিছনে ইজরায়েল যে কারণ দেখাচ্ছে, শুনলেই বোঝা যাবে, তা অজুহাত মাত্র। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, লেবাননের জঙ্গি সংগঠন হিজবুল্লার লোকেরা নাকি অপহরণ করেছে দুই ইজরায়েলি সেনাকে। তাদের অপর এক সেনাকেও নাকি অপহরণ করেছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিরা। অতএব এইসব জঙ্গি সংগঠন, বিশেষত হিজবুল্লার দক্ষিণ লেবাননের সমগ্র পরিকাঠামো যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া যাচ্ছে, ততদিন ইজরায়েল তাদের হানাদারি, গণহত্যা চালাবে, বরং তা আরও তীব্র করবে। আর অন্যান্য যেসব দেশ এই হিজবুল্লাদের পিছনে আছে বলে ইজরায়েল মনে করছে, সে সিরিয়া হোক কি জর্ডন, ইজরায়েলি বাহিনী কাউকে রেহাই দেবে না।

ইজরায়েলি বাহিনীর এই রক্তচক্ষু, তাদের প্রধানমন্ত্রীর এই রণহুঙ্কার প্রচারমাধ্যমে কল্যাণে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে। কেবল আকাশপথে আক্রমণ নয়, গত ২ আগস্ট প্রায় ১০ হাজার ইজরায়েলি সেনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ লেবাননের প্রায় ৮০ কিমি অভ্যন্তরে। লক্ষ্য তাদের প্রাচীন শহর বালবেক।

লেবানন বা প্যালেস্তাইনের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই তাদের ওপর এই ধরনের বহু ইজরায়েলি আক্রমণ, হানাদারি, একতরফা গণহত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে। আজকের ঘটনার স্বরূপ বুঝতে গেলেও আমাদের অবশ্যই চোখ ফেরাতে হবে ইতিহাসের সেই পর্বটুকুর দিকে, যার সঙ্গে যুক্ত সমগ্র নিকট প্রাচ্যেরই ইতিহাস।

আজ যে অঞ্চলে লেবানন, ইজরায়েল, সিরিয়া, জর্ডন প্রভৃতি দেশগুলি অবস্থিত, সেই সমগ্র অঞ্চলটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৮ সালে তুরস্ক পরাজিত হলে এই অঞ্চল থেকে তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে ও অঞ্চলটি ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে যায়। এই সময়েই এই অঞ্চলের ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দক্ষিণের অংশটিতে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের জন্য উপনিবেশ গড়ে তোলা শুরু হয়। মুখে বলা হয়, ইহুদিদের মাতৃভূমিতে ফেরানোই তাদের লক্ষ্য, আসলে তাদের লক্ষ্য ছিল, তৈলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলিকে কবজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যার নাম ইজরায়েল। সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় ছিল এটিই যে, ঐ অঞ্চলে প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি বছরের অতি পরিচিত প্রাচীন দেশ 'ফিলিস্তিন' ও তার বাসিন্দা জনসাধারণের অস্তিত্বই প্রায় স্বীকার করা হয়নি এই পরিকল্পনায়। অথচ সেই সপ্তম খ্রিস্টাব্দের শেষপাদ অর্থাৎ ইসলামের প্রায় সূচনাপর্ব থেকেই অসংখ্য আরবি লেখাপত্রে এই অঞ্চলের নাম এক অতি সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে উল্লিখিত হয়ে আসছে। সেখানে এখন প্রচারের কল্যাণে বড় হয়ে উঠতে শুরু করল বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী, ইহুদি ধর্মপ্রচারক মোজেসের ঈশ্বরপ্রাপ্তির কাহিনী, তাঁর প্রতিশ্রুত দেশ ইজরায়েল, পবিত্র শহর জেরুজালেম ও তার পার্শ্ববর্তী জিওন পাহাড়। সেদিনের সেই আরবি ফিলিস্তিনই আজকের সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত প্যালেস্তাইন।

ইউরোপে ত্রিশের দশকে নাৎসিদের হাতে ইহুদি নিধন শুরু হতে খুব স্বাভাবিকভাবেই সারা পৃথিবীর মানুষের সহানুভূতি তাদের দিকেই প্রবাহিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে অত্যাচারিত ইহুদিদের প্রতি এই সহানুভূতিকেই সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে শুরু হয় এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন অভিযান। ফ্রান্স বা ব্রিটেনকে সরিয়ে এবার সেখানে মূল ভূমিকা নেয় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নতুন সর্দার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লক্ষ্য তার খুব স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের অতুল সম্পদ — খনিজ তেল ও তার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ তার সেই লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে বড় বাধা। সুতরাং ওই অঞ্চলে আরব জাতীয়তাবাদ বিরোধী, সামরিক দিক থেকে প্রবল শক্তিশালী, কিন্তু আমেরিকার উপর বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে খুবই সহায়ক। প্রস্তাবিত রাষ্ট্র ইজরায়েলের মধ্যে ওয়াশিংটন এই ব্যাপারে দেখতে পায় বিপুল সম্ভাবনা। অতএব দুনিয়াজোড়া মার্কিন নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমে ইতিহাসের থেকেও বড় হয়ে উঠতে শুরু করল বাইবেলের গল্পকথা। তার সাথে মিশে গেল ইউরোপে ইহুদি নিধনের মর্মন্তুদ কাহিনী। সত্য-মিথ্যার এই মিশেল আর সহানুভূতির প্লাবনে হারিয়ে গেল এই অঞ্চলে বসবাসকারী মূল অধিবাসী, বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্যালেস্তিনীয় জনগণ। সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল তাদের অস্তিত্ব।

১৯৪৮ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হল ইজরায়েল। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে, উগ্র ইহুদিবাদী জিওনিস্টদের গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির তাণ্ডবে তার কয়েকমাসের মধ্যেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হল ৭ লক্ষ ৮০ হাজার প্যালেস্তিনীয় (তথ্যসূত্র ঃ দি কোয়েশ্চেন অফ প্যালেস্তাইন, এডওয়ার্ড সঈদ)। আরও হাজার হাজার মানুষ হ'ল গণহত্যার শিকার। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে মিশিয়ে দেওয়া হল মাটির সাথে, লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ প্যালেস্তিনীয় নাগরিক বাধ্য হল দেশ ছাড়তে। আর যারা তারপরেও থেকে গেল, তারা কাটাতে বাধ্য হল সমস্ত রকম অধিকার বঞ্চিত মনুষ্যেতর জীবন। দেড় হাজারেরও বেশি বছরের পুরনো দেশ প্যালেস্তাইন মুছে গেল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে, সেখানে জাঁকিয়ে বসল সাম্রাজ্যবাদের মদতে তৈরি নতুন দেশ ইজরায়েল, বছর কয়েক আগেও যার কোন অস্তিত্বই ছিল না।

ঐ অঞ্চলের ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী উত্তরের অঞ্চলটিতে লেবানন পর্বত — মারোনাইট খ্রিস্টান ও দ্রুজ মুসলমানদের দীর্ঘকালীন বাসস্থান। এই অঞ্চলটির শাসনভার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চলে গিয়েছিল ফরাসিদের হাতে। পার্শ্ববর্তী দেশ সিরিয়াও ছিল তাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে। ফরাসিরা এই সময় শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে সিরিয়ার পশ্চিমদিকের কয়েকটি অঞ্চলকে লেবানন পর্বতের সাথে যুক্ত করে তৈরি করে বর্তমান লেবানন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের হাতে ফরাসিরা পরাজিত হলে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে লেবানন স্বাধীন হয়। কিন্তু শুরু থেকেই এই দেশের মানুষ একটি জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। সিরিয়া থেকে কেটে নেওয়া দেশের অংশটিতে শিয়া মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হওয়ায় সংখ্যালঘু মারোনাইট খ্রিস্টানরা আতঙ্কে ভুগতে থাকে। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির ফলে শুরু হয়ে যায় জাতিদাঙ্গা। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইজরায়েল থেকে বিতাড়িত প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তুরা এই দেশে ঢুকে পড়তে বাধ্য হলে পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি পায়। আর মার্কিনসহ অন্যান্য সাম্রাজ্য-বাদীদেরও স্বার্থ ছিল এই অঞ্চলে কোনও রকম জাতীয়তাবাদেরই বিকাশ ঘটতে না দেওয়া। কারণ জাতীয়তাবাদ এইসব অঞ্চলে মাথা তুললে প্রতিটি দেশেরই তৈলসম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা পড়বে। এই উদ্দেশ্যেই তারা এইসব দেশের সংখ্যালঘু শাসক তথা রাজা আমির-ওমরাহদের সমর্থন করতে থাকে। জাতিদাঙ্গায় দীর্ণ লেবাননেও তারা এই দাঙ্গায় জড়িত বিভিন্ন পক্ষকে সমর্থন করতে থাকে। ভূমধ্যসাগর তীরের এই অতি মনোরম ছোট্ট সুন্দর দেশটির গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসই ক্ষেপে ক্ষেপে চলতে থাকা নানান জাতিদাঙ্গা, তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বহিরাগত শক্তি, বিশেষত ইজরায়েলের আক্রমণ, তাকে মার্কিন সমর্থন, রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর আগমন, সিরিয়ার হস্তক্ষেপ প্রভৃতি নানা ঘটনায় কণ্টকিত।

এদিকে ইজরায়েলের আক্রমণে প্যালেস্তিনীয় আরবরা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তুরূপে আশেপাশের নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেসব দেশের জনগণও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মন থেকে উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে প্রতিরোধ আন্দোলন। আর এই প্রতিরোধ আন্দোলনকেই সন্ত্রাসবাদ ও তাদের আশ্রয়দাতা দেশগুলিকে সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা আখ্যা দেয় আমেরিকা ও ইজরায়েল। এই অজুহাতে তারা তাদেরই মদতপুষ্ট উগ্র ইহুদিবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হাগানা, ইরগুণ ও সশস্ত্র ঘাতকদের দিয়ে ঐসব দেশে চালাতে শুরু করে হানাদারি। পরবর্তীকালে গুপ্ত সংগঠনের স্থান নেয় মার্কিন মদতে তৈরি অত্যাধুনিক ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। গত যাট বছরে বার বার এইভাবে ইজরায়েল নানান দেশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৬৭ সালের আক্রমণ। এই সময় আক্রমণ চালিয়ে জর্ডনের কাছ থেকে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর (ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক) ও মিশরের সিনাই মরু অঞ্চল ও গাজা ভূখণ্ড এবং সিরিয়ার গোলান হাইটস্ ইজরায়েল দখল করে নেয়। গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক অঞ্চলে বাস্তবে প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তুরা নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিল। সেই থেকে এই অঞ্চল দু'টি এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীর দখলে। এই অঞ্চল দু'টিতেই বর্তমানে বহু উত্থানপতন, টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির মাধ্যমে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও প্যালেস্তিনীয়দের স্বশাসন স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও সেটলার ইহুদিদের মাধ্যমে ইজরায়েল সেই স্বশাসনকে পরিহাসে দাঁড় করিয়েছে।

অপরদিকে লেবাননের দক্ষিণ অংশে আশ্রয় নেওয়া সাড়ে ৪ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু ও তাদের আন্দোলনকেও সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিয়ে ইজরায়েল বারেবারেই ঢুকে পড়তে থাকে দক্ষিণ লেবাননে ও দখল করে নিতে থাকে তার বিভিন্ন অঞ্চল। এই একই অজুহাতে তারা ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ৭০-এর দশক পর্যন্ত বারেবারেই হানাদারি চালিয়েছিল দক্ষিণে মিশরে। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশহারা অত্যাচারিত প্যালেস্তিনীয়দের পক্ষে গড়ে উঠতে থাকা আন্তর্জাতিক জনমতের প্রবল চাপে শেষপর্যন্ত ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে এক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ইজরায়েল মিশর থেকে সরে আসতে বা সেখান থেকে দখলদারি গুটিয়ে আনতে বাধ্য হয়। কিন্তু এবার তারা তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় তাদের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত লেবানন ও তার পূর্বে সিরিয়ার দিকে। বরাবরের মতই এক্ষেত্রেও তাদের পিছনে মদতদাতার নির্লজ্জ ভূমিকায় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। তাদেরই নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন ইজরায়েলকে সমগ্র আন্তর্জাতিক জনমতকে উপেক্ষা করে এই নির্লজ্জ হানাদারি চালিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাচ্ছে।

৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইজরায়েল ও তার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু ও তাদের নানা মুক্তিসংগঠনকে একত্রিত করে একসূত্রে বাঁধার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO)। এদের নেতৃত্বে নতুন উদ্যমে তারা শুরু করে তাদের জন্মভূমি উদ্ধারের আন্দোলন। ইজরায়েল অধিকৃত জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চলে যেমন ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রবল দমনপীড়নকে উপেক্ষা করেই দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে এই আন্দোলন, তা দেখতে দেখতেই ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির উদ্বাস্তু প্যালেস্তিনীয় শিবিরগুলিতেও। আর লেবাননের প্যালেস্তিনীয় উদ্বাস্তু শিবিরে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনকেই অজুহাত করে ইজরায়েল। তাদের অভিযোগ, প্যালেস্তিনীয় সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে লেবানন এবং সে কারণেই তারা লেবাননকে আক্রমণ করছে। তাদের এই আক্রমণের ফলশ্রুতিতে গত শতাব্দীর সমগ্র ৭০-এর দশক জুড়েই ভূমধ্যসাগর তীরের এই ছোট্ট সুন্দর দেশটির ইতিহাস আমরা বারে বারে রক্তাক্ত হয়ে উঠতে দেখি। ১৯৭১-৭৩ এবং ৭৫-৭৬-এ সেখানে অবরোধ, হানাদারি ও প্রভূত রক্তপাতের পর ১৯৭৮ সালের ১৪ মার্চ ইজরায়েল আবার ঢুকে পড়ে লেবাননে ও দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের এক বিরাট এলাকা দখল করে নেয়। এর ৫ দিন পর

আটের পাতায় দেখুন

সুস্থ ছাত্র রাজনীতি নিশ্চিত করতে হবে

একের পাতার পর

এস এফ আই-এর রাজ্য সম্পাদক বললেন, সৌমিক তাদের সংগঠনের সাথে যুক্ত নয়। পরে তাকেই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী দাবি করে ধর্মঘট ডেকে দিলেন। ওদের রাজ্য সভাপতি সৌমিকের মৃত্যুর মধ্যে অন্যদের ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন; অথচ, এস এফ আই-এর বি ই কলেজ ইউনিটের সম্পাদক বললেন, এটি নিছকই দুর্ঘটনা!

বি ই কলেজে বহিরাগতদের সাহায্য নিয়ে এস এফ আই-এর সন্ত্রাস এইবারই প্রথম নয়। এলাকার মানুষ জানেন, কলেজের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরাও জানেন, এটা প্রতি বছরের ঘটনা। কলেজের ইউনিয়ন দখলের জন্য প্রতি বছরই নির্বাচনের আগে এস এফ আই বহিরাগতদের নিয়ে এসে সন্ত্রাস চালায়। প্রতিবছরই কোনও না কোন ছাত্রের হাত-পা ভাঙে, মাথা ফাটে, যে সংবাদ বাইরে প্রচার হয় না। এ বছর ঘটল আরও মর্মান্তিক এই মৃত্যুর ঘটনা, ফলে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, আলোড়নও সৃষ্টি হয়েছে।

শুধু বি ই কলেজের ছাত্ররাই এই সন্ত্রাসের শিকার নয়, গত ৩০ বছর ধরে এ রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলির চেহারা কী? ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর এ রাজ্যের প্রায় সমস্ত ছাত্র সংসদ চলে গিয়েছিল ছাত্র পরিষদের হাতে — নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে নয়, গায়ের জোরে দখলদারির মাধ্যমে। একইভাবে ১৯৭৭ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বড় শরিক সিপিএম-এর ছাত্র সংগঠন এস এফ আই একের পর এক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ দখল করতে থাকে এবং সেটাও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে নয়, গায়ের জোরে। তবে ছাত্র পরিষদ ১৯৭২ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত নির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে যেভাবে খোলাখুলি ছাত্রসংসদগুলো দখল করেছিল, ধূর্ত সিপিএম নেতৃত্ব এস এফ আইকে দিয়ে সেটা করায়নি। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের বাইরের ঠাটবাট বজায় রেখেই এমনভাবে তা পরিচালনা করা হয়েছে, যাতে এস এফ আই কার্যত কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতারই সম্মুখীন না হয়। এ ব্যাপারে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত অধ্যাপকরা পর্যন্ত এস এফ আইকে যাবতীয় অপকর্মে সহায়তা দিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ, অধ্যাপক থেকে উপাচার্য নিয়োগ ও পরিচালন সমিতি গঠন সবই সিপিএম নেতৃত্বের ইচ্ছামতোই হয়ে আসছে। ফলে বহুক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ছাত্রসংসদ নির্বাচনের নোটিশ জারি করে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর। অবশ্য ততদিনে এস এফ আই-এর সমস্ত মনোনয়ন পত্র জমা পড়ে যায়। আবার কোথাও মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়ার দিনক্ষণ বিরোধী ছাত্র সংগঠনের পক্ষে কোনক্রমে আগে জানা সম্ভব যদি হয়ও, অফিসে গিয়ে তারা দেখে কাউন্টারের সামনে বিশাল ভিড়, বাইরে থেকে লোক এনে বা কলেজেরই কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে লাইন আর এগোয় না। কিন্তু ঐ লাইনে এস এফ আইকে দাঁড়াতে হয় না, তাদের জন্য ভি আই পি ব্যবস্থা, তাদের অফিস থেকে মনোনয়নপত্র দিয়ে দেওয়া হয়। পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজে গত কয়েক বছর ধরে এ জিনিসই ঘটে চলেছে। কারণ কর্তৃপক্ষ জানে, অবাধ নির্বাচন হলে এস এফ আই'র পরাজয় এবং এ আই ডি এস ও'র জয় ঐ কলেজে নিশ্চিত। আবার অন্য যে কলেজে বিরোধী ছাত্র সংগঠন মনোনয়নপত্র তোলার সুযোগ পায়, সেখানে স্ক্রুটিনি টেবিলেই সিপিএম-সমর্থক অধ্যাপকদের সাহায্যে বিরোধীদের বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। এরপরও যে দু'চারজন প্রার্থী টিকে থাকে, তারাও যাতে নির্বাচন থেকে সরে যায়, প্রার্থীপদ তুলে নিতে বাধ্য হয়, সেজন্য তাদের উপর শুরু হয় মানসিক নির্যাতন, বাড়ি বাড়ি ধাওয়া করা হয়, অভিভাবকদের ভয় দেখানো হয়, এমনকী ছাত্রদের দৈহিক নির্যাতনও বাদ যায় না। এই প্রবল চাপের মুখে অনেকেই প্রার্থীপদ তুলে নিতে বাধ্য হয় — ঘোষিত হয় এস এফ আই-এর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়। যারা সমস্ত ভয়-সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে, তারা যাতে জিততে না পারে তার জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই ভোট দিতে আসতে ভয় পায়। বিপুল সংখ্যাধিক্যে এস এফ আই-এর জয় সুনিশ্চিত হয়! এস এফ আই'র এই সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গেছে যে, মেয়েদের কলেজে ছেলেরা দলবদ্ধভাবে ঢুকে ছাত্রী, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের উপর চড়াও হতেও পিছপা হয় না। যোগমায়াদেবী কলেজে প্রতি বছর এ জিনিস ঘটে চলেছে। এই কলেজে দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে এ আই ডি এস ও পরিচালিত ছাত্রী সংসদকে ভাঙবার জন্য সিপিএম-এস এফ আই বহুদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে হুগলিতে শ্রীরামপুর গার্লস কলেজের নির্বাচনেও দু'বছর আগে সমাজবিরোধীদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে ছাত্রীদেরকে ভোটদানে বিরত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও ছাত্রীরা সমস্ত ভয়ভীতি সন্ত্রাস উপেক্ষা করে এ আই ডি এস ও প্রার্থীদেরই জিতিয়েছে। প্রতি বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের বেশিরভাগ কলেজ ও ক্যাম্পাসে এ জিনিস ঘটে চলেছে। এস এফ আই-এর এই সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে এ আই ডি এস ও কর্মীরা। এমনকী এ ঘটনাও ঘটেছে, সিপিএমের অধ্যাপকরা ক্লাসের মধ্যেই এ আই ডি এস ও কর্মীদের শাসাচ্ছে যে, 'কেমন করে পাশ করতে পার দেখে নেব।' এস এস কে এম মেডিক্যাল কলেজে এ জিনিস ঘটেছে। আবার কোথাও পরীক্ষার হলে সিপিএম সমর্থক ইনভিজিলেটর এ আই ডি এস ও সমর্থক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে খাতা কেড়ে নিয়ে 'টোকাটুকি করার' মিথ্যা অভিযোগ তুলে RA করে দিয়েছে, যদিও এরকম কোন ঘটনার সাথে সে যুক্তই ছিল না। এগুলি করাই হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে, ডি এস ও করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ আই ডি এস ও'র প্রতি এই বিদ্বেষের কারণ হচ্ছে, এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ ও আন্দোলন সংগঠিত করেছে এ আই ডি এস ও'ই। আবার একথাও সত্য যে, যে সমস্ত কলেজে ছাত্র পরিষদ বা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ছাত্র সংসদে ক্ষমতাসীন, সেখানে তারাও কলেজ ক্যাম্পাসকে বিরোধী শূন্য করার জন্য একইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। যেমন কাঁথিতে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে এ আই ডি এস ও কর্মীরাই। কারণ ছাত্র ও শিক্ষার স্বার্থে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার সংগঠন একটিই এখন আছে তা হচ্ছে, এ আই ডি এস ও।

এখন প্রশ্ন হল, এস এফ আই বা ছাত্র পরিষদকে নির্বাচনে জেতার জন্য এভাবে হামলার পথে যেতে হচ্ছে কেন? সকলেই জানেন, এই ছাত্র সংগঠনগুলি সরকারের চূড়ান্ত ছাত্রস্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির কট্টর সমর্থক। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যখনই শিক্ষাস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে, এই সংগঠনগুলি তাকেই দু'হাত তুলে সমর্থন করে গেছে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া হলে, মাধ্যমিকে অবৈজ্ঞানিক ইংরেজী সিলেবাস চালু করলে, আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্কিম চালু করা হলে, কলেজে ফি-ডোনেশন বৃদ্ধি করা হলে, শিক্ষার বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ করা হলে বা বর্তমানে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার যে অপচেষ্টা চলছে — কোনক্ষেত্রেই এস এফ আই বা ছাত্র পরিষদ প্রতিবাদ শুধু করে না তাই নয়, এসবের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র আন্দোলন ভাঙবার জন্য বারবারই আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। অনেকের হয়তো স্মরণে আছে, শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র সনু প্যাটেল ফি-বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে এস এফ আই-এর ভূমিকার বিরুদ্ধতা করায়, এমনভাবে তাকে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে মারা হয়েছিল যে, তার মৃত্যু ঘটেছিল। বস্তুত এস এফ আই, ছাত্রপরিষদ প্রভৃতি সংগঠনগুলি শিক্ষাবিরোধী সরকারি সিদ্ধান্ত ছাত্রদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়ানোর জন্য সরকারের হাতে আন্দোলন ভাঙার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে কলেজে কলেজে এইসব সংগঠনগুলির নেতা ও কর্মী হিসাবে যাদের দেখা যায়, তাদের আচার-আচরণে নৈতিকতা, এমনকী সভ্যতা-ভব্যতার লেশমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় না। একদিকে দেউলিয়া রাজনীতি, তার সাথে রুচিহীন, সংস্কৃতিহীন আচরণ কখনই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সমর্থন সৃষ্টি করতে পারে না এবং তা নেইও। এই অবস্থায় নির্বাচনে জেতার জন্য সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন ছাড়া এই সংগঠনগুলির কোন উপায় থাকে না। ওরা নীতি, আদর্শ, নম্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য এসবের দ্বারা কাছে টানতে পারে না বলেই ভয় দেখিয়ে, চাপে ফেলে, মারপিট করে নিজেদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের আনতে চায়। এই কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ হত্যা করা ওদের এত প্রয়োজন। বি ই কলেজসহ সর্বত্র এস এফ আই-এর ধারাবাহিক ঘৃণ্য ভূমিকার জন্যই এ আই ডি এস ও বলেছে যে, সৌমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্র ধর্মঘট ডাকার নৈতিক অধিকার এস এফ আই-এর নেই।

এজন্যই এস এফ আই-এর সন্ত্রাস ও দুষ্ট রাজনীতির প্রতিবাদে ঐ দিনই রাজ্যব্যাপী ছাত্রধর্মঘটের ডাক দেয় এ আই ডি এস ও। লক্ষণীয়ভাবে ছাত্র ধর্মঘটের দিনও এস এফ আই-এর সন্ত্রাস ছিল অব্যাহত এবং তাদের টার্গেট ছিল বরাবরের মতোই এ আই ডি এস ও। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, পুরুলিয়ার জে কে কলেজ ও নিস্তারিণী কলেজ, মেদিনীপুরের খড়গপুর কলেজ, বর্ধমানের রাজ কলেজ সহ এ রাজ্যের বহু স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন এ আই ডি এস ও কর্মীদের উপর চড়াও হয়েছে এস এফ আই কর্মীরা।

সৌমিক বসু'র দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গে এ রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকার কিছু দিক আমরা তুলে ধরলাম, যাতে ঠিক কারা, কী কারণে ছাত্র রাজনীতিতে হিংসার আমদানি করেছে, তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এটা আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন। মিডিয়া যেভাবে ছাত্ররাজনীতিকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে, এবং কিছু বিভ্রান্ত মানুষ ও একদল ধুরন্ধর রাজনীতিকদের সহায়তায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকেই বাতিল করার আওয়াজ তুলেছে, বিশেষভাবে ছাত্রসমাজ ও সাধারণভাবে জনসমাজের মধ্যে রাজনীতি বিমুখতায় ইন্ধন দিচ্ছে, তাতে গভীর বিপদের সম্ভাবনা নিহিত আছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না। তাঁর আহ্বানে সেদিন ছাত্ররা দলে দলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আজ যে সরকারের শিক্ষা সংকোচন, ফি বৃদ্ধি, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারীকরণের নীতির ফলে ছাত্ররা ব্যাপকহারে শিক্ষার আঙিনা থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে বা ঢুকতে

আটের পাতায় দেখুন

এই হল এস এফ আই-এর আসল চেহারা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে লোহার রড হাতে মারমুখী ঐ যুবকটি কে ? কোনও দাগী ক্রিমিনাল নয়, সি পি এমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই পরিচালিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের তৎকালীন সহ সম্পাদক। তার রডের লক্ষ্য হচ্ছে একজন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ডি এস ও ছাত্রীকর্মী। ১০ নভেম্বর '০৩ ডি এস ও'র ডাকা ছাত্র ধর্মঘট ভাঙতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবেই রড-লাঠি নিয়ে ডি এস ও কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এস এফ আই বাহিনী। পুলিশ উপস্থিত থেকেও নীরব দর্শকমাত্র। (ছবিঃ হিন্দুস্থান টাইমস ১১.১১.০৩)

খাদ্যব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থই দেখছে সরকার

একের পাতার পর

কোন বিপর্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং আনুমানিক উৎপাদন বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। তাহলে সরকার রেকর্ড পরিমাণ আমদানি করছে কেন? হিসাবই বলছে, উৎপাদন ঘাটতির কারণ দর্শানো তাই নিতান্তই অজুহাত।

চিনির দিকে তাকালেই এই তিক্ত সত্যি কথাটা ধরা যাবে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরে ২০০৫-০৬ সালে দেশে চিনি উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৯০-৯১ লক্ষ টন। দেশে চিনির চাহিদার তুলনায় উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১০-১১ লক্ষ টন বেশি। চিনির চাহিদা বছরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন। এর মধ্যে ১৬ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত চিনি গত মাসে পাকিস্তানে রপ্তানির অনুমতি দিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার। এর পরিণাম হল মজুতভাণ্ডারে টান পড়া। চিনির দাম বাড়ল। রপ্তানির হুকুমদার সরকার আবার এখন চিনি আমদানির হুকুম দিয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন থাকেই, আমদানি বা রপ্তানি, ঘাটতি এবং উদ্বৃত্তের নিরিখে পরিচালিত হচ্ছে কি? সরকারি হিসাব থেকেই দেখা যাচ্ছে, চিনির ক্ষেত্রে মজুতের ঘাটতি সৃষ্টি হল রপ্তানির কারণে, মূল্যবৃদ্ধি হল রপ্তানির কারণে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকে সরকার কি সরে আসছে? চিনি আমদানির পর প্রতি কেজির দাম পড়বে ২২ টাকা। এর সঙ্গে যোগ হবে পরিবহন খরচ ও খুচরা ব্যবসায়ীদের লাভ। এসব ধরে দাম হয়ে যাবে কেজি প্রতি ২৫ টাকা। অথচ দেশজ চিনি কেজি প্রতি ১৮ টাকা। অন্যান্য খরচ ধরে ২২ টাকার বেশি হয় না। ২০০৪-০৫ -এ চিনি উৎপাদন হয়েছিল ১২০ লক্ষ টন। ২০০৫-০৬-এ আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ৭১ লক্ষ টন। আর ২০০৬-০৭-এ উৎপাদনের পরিমাণের আগাম হিসাব ২৩০ লক্ষ টন। এজন্যই শেয়ার বাজারে চিনি কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম উর্ধ্বমুখী। ভারতের সবচেয়ে নামী চিনি কোম্পানি বাজাজ হিন্দুস্থান-এর শেয়ারের দাম ৪৫০ টাকার বেশি। দ্বারকেশ্বর সুগার, শ্রীরেণুকা সুগার, শান্তি সুগার, বলরামপুর চিনি মিল ইত্যাদির রমরমা অবস্থা। (২৬ জুন সংবাদ প্রতিদিন) সে যাই হোক, চিনির যোগানে সঙ্কট বৃদ্ধি, চিনির মজুতে ঘাটতি, চিনির মূল্যবৃদ্ধি এবং চিনি আমদানির ব্যাপারে উৎপাদন হ্রাসের দোহাই দেওয়া অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। বরং দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও সঙ্কট হচ্ছে — দামও বাড়ছে, আমদানিও হচ্ছে। গমের ক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ উৎপাদন হ্রাসবৃদ্ধির সাথে এখন আমদানির সম্পর্ক নেই। চিনির ক্ষেত্রে সরকারি মজুতে ঘাটতি উৎপাদন কম-বেশির সঙ্গে জড়িত নয়। সরকার যে চিনি আমদানি করছে তার উপর শুল্কও কমানো হয়েছে। সাধারণভাবে আমদানি করা চিনির ওপর ৬০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়। এখন যে আমদানি হবে তাতে এই হারে শুল্ক থাকবে না। অনুরূপভাবে গমের ওপর ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। অবশ্য শুল্ক কমায় বাজারদর কমবে না, বাড়তি টাকাটা যাবে খাদ্যব্যবসায়ীদের পকেটে। আমদানি শুল্ক থাকলে সরকারি তহবিলে যে টাকাটা আসত তা আসবে না। শুল্ক কমানোর ফলে সরকারি আয়ের যে ঘাটতি হবে, হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্যাক্স বাড়িয়ে সরকার তা তুলবে জনগণের পকেট কেটে, নয়ত ঘাটতির অজুহাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি বরাদ্দ ছাঁটাই করবে, রেশনে চাল-গম-চিনির দাম বাড়াবে। অর্থাৎ শুল্ক হ্রাসের ফায়দা নেবে খাদ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। তারা কম দামে কিনে, বাজারে চড়া দরে বেচবে। আর শুল্ক হ্রাসের মাশুল দিতে হবে জনগণকে। তাছাড়া এবার আমদানি তো শুধু সরকার করছে না, করছে বেসরকারি সংস্থাও। তারাও শুল্কহীন বা নামমাত্র শুল্কের সুযোগ নিয়ে সস্তায় আমদানি করবে। কতটা আমদানি করবে — তা নিয়ন্ত্রণ সরকার করবে না, বা তা জানারও পরিকাঠামো সরকার গড়ে তুলবে না। বাজারের ওপর একচেটিয়া দখল সরকার ছেড়ে দেবে বেসরকারি ব্যবসাদারদের হাতে। সেই সুযোগে বাড়তি লাভ তারা তুলে নেবে। মূল্যবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ দূরে থাক, বিনিয়ন্ত্রণই বাড়বে, বাড়বে মজুতদারিও।

গম সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধিরোধ প্রসঙ্গে মিথ্যাচার

অগণিত মানুষের প্রধান খাদ্য হিসাবে গমের গুরুত্ব চিনির চেয়ে অনেক বেশি। এবার সেই গমের দিকে নজর দেওয়া যাক। উৎপাদন কম-বেশি একই পরিমাণ থাকলেও গমের আমদানিও এদেশে মোটেই নতুন নয়। যেমন ১৯৯৮ সালে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গম ব্যবসায়ী সংস্থা অস্ট্রেলিয়ান হুইট বোর্ডের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টন গম কিনেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ এই সময়ে, অর্থাৎ বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের আমলে, মজুদ ভাণ্ডারে ছিল ৬ কোটি টন খাদ্যশস্য। কাজেই আমদানির সিদ্ধান্ত বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক কি না, এই প্রশ্নই এসে যাচ্ছে। এবারে যে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টন গম উৎপাদন হয়েছে, তা থেকে কি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা যেত না? শুধু তাই নয়, আমদানি করা গমের দাম স্থানীয় দামের চেয়ে বেশি হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ইকনমিক অ্যাডভাইসারি কমিটিও পরিষ্কারই বলেছে "খাদ্যশস্যের দাম কমবে না, বরং তা বেড়েই চলবে।" অবশ্য মূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা — 'স্বাস্থ্যসম্মত' (healthy trend) (সূত্র ঃ দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২৩-৬-০৬)। তাহলে এত ঘটা করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার যুক্তি তোলা হচ্ছে কেন? এই মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা কাদের জন্যই বা 'স্বাস্থ্যসম্মত'? এই প্রশ্নের সামনে বলা হচ্ছে, 'গত এক বছরে আন্তর্জাতিক স্তরে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ২০-৩০ শতাংশ।' খাসা যুক্তি — চাহিদা বেশি, জোগান কম, দাম তো বাড়বেই। ভারতবর্ষের মজুত ভাণ্ডারটিতে গম ছিল ৩.৫ কোটি টন। এখন আছে মাত্র ২০ লক্ষ টন। সুতরাং সরকারি যুক্তি — জনগণকে বাঁচাতে, গম আমদানি করতে হবে এবং বাধ্য হয়ে বেশি দাম দিয়েই মানুষকে তা কিনতে হবে। দাম বাড়বেই — এই হল সরকারি যুক্তিধারা। সরকারের ভাবখানা — এসব না করলে দাম আরও বাড়ত। অর্থাৎ আরও বেশি মূল্যবৃদ্ধির ভয় দেখিয়ে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধিকে মানতে বাধ্য করা।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং সমস্ত বেকারের চাকরির দাবিতে ৫ই আগস্ট বিহার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে পাটনায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

মজুতভাণ্ডার ও সংগ্রহব্যবস্থা

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে যে — কিছুদিন আগেই যে সরকারি মজুতভাণ্ডার উপচে পড়েছিল, সেটা গেল কোথায়? তার উপর গম সংগ্রহ করার জন্য যে সরকারি ব্যবস্থা আছে তার সাহায্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন গম, যা আমাদের গণবণ্টন ব্যবস্থার চাহিদা হিসাবে বর্তমানে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, তা সংগ্রহ করা হল না কেন? কেন মাত্র ৯০ লক্ষ টন গম সংগ্রহ করা হয়েছিল? সরকার দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে ন্যূনতম এই পরিমাণ সংগ্রহ করতে পারল না, নাকি করল না? এটা কি অযোগ্যতা, নাকি ইচ্ছাকৃত অবহেলা? সরকার টন প্রতি গমের সংগ্রহ মূল্য স্থির করেছিল ৭০০০ টাকা। বেসরকারি সংস্থাগুলি সরকারি দামের চেয়ে নামমাত্র বেশি দিয়ে গম নিজেদের কবজায় এনে ফেলেছে। অথচ এই সরকারই ১০,০০০ টাকা টন দরে গম আমদানি করছে এবং শুল্ক ছাড় দিচ্ছে। কেন? চাষীদের কিছু বেশি দাম দিলে বেসরকারি সংস্থাগুলি কি বাজার থেকে সমস্ত গম নিজস্ব কবজায় আনতে পারত? এসব প্রশ্নের উত্তরই প্রমাণ করে, খাদ্যের বাজারে বেসরকারি মালিকদের থাবা বসানো ও বিপুল মুনাফা লোটার ব্যবস্থা সরকার নিজেই করে দিয়েছে। বাজারে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি 'স্বাস্থ্যসম্মত' ঠিকই, তবে তাতে খাদ্যব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বাস্থ্যই ভালো হচ্ছে। অভুক্ত জনগণ মরছে অনাহার ও অপুষ্টিতে।

ঘাটতি ও মজুত সম্পর্কে কারচুপি

মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার খরচ কমিয়ে দেওয়া ও তাকে ইকনমিক (লাভজনক) করে তোলার পথটি সরকার নিয়েছে। উৎপাদিত খাদ্যশস্য সরকারের হাতে এনে রেশন মারফত গরিবের হাতে দেওয়ার সঠিক নীতি সরকার নেয়নি। তার বদলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের রপ্তানিকারক সংস্থার হাতে উৎপাদিত খাদ্য নামমাত্র মূল্যে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারি নির্দেশে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষদের জন্য যে দর সেই দরে, এমনকী তার থেকেও কম দরে, রপ্তানি বাণিজ্যকারী ব্যবসায়ীদের হাতে গমভাণ্ডারটি তুলে দেয়। 'পরিবহন বাবদ ভর্তুকির' লেবেল মেরেই সরকারি ভাণ্ডারের খাদ্যশস্য সস্তায় বেচে দেওয়ার এই অপকীর্তি করা হয়েছে ডব্লুও টি ও'র (বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার) আইনকে পাশ কাটিয়ে। এইভাবে চলতি দশকের প্রথম পাঁচবছরে গমের রপ্তানি-বাণিজ্য বেড়েছে ৪.৫ গুণ। সাধারণ মানুষের মুখের আহার এইভাবে রপ্তানিকারক সংস্থাগুলিকে মুনাফার জোগান দিয়েছে। এদেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা জনতার পাশে দারিদ্র্যসীমার উপরের জনতাও বাস্তব বিচারে গরিব শুধু নয়, নিদারুণ গরিব। সরকারি নীতির ফলে তারা সস্তায় খাদ্য পেল না, পেল রপ্তানিকারী মুনাফাখোরেরা। এইভাবে সরকার মজুতভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে, খাদ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফা এবং জনতার খাদ্য সুরক্ষার সর্বনাশের ব্যবস্থা করেছে। এই কাণ্ডটি ঘটেছে এবারও ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত — অর্থাৎ যখন সরকার গম উৎপাদনে বিপর্যয়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করে গম আমদানির ফর্মুলা বাতলেছে, ঠিক তখনই সরকারি মজুতভাণ্ডার থেকে বিক্রি করা হয়েছে ৭ লক্ষ টন গম। আর সেই ফেব্রুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণের রাজ্যগুলির জন্য, বিশেষত কেরল ও কর্ণাটকের জন্য শুল্ক ছাড় দিয়ে ৫ লক্ষ টন গম আমদানির হুকুম দিয়েছে। আর ২১ এপ্রিল যখন মাঠ থেকে গম কেটে তোলার কাজ পুরোদমে চলছে তখনই ঘোষণা করা হয়েছে, আরও ৩০ লক্ষ টন গম আমদানি করা হবে। সরকারের অজুহাত হ'ল — খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার দুর্বল, এবং খাদ্যসংগ্রহও ভাল হয়নি। (সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ৩০-৬-০৬) বোঝা যায়, আগাম ঠিক করাই ছিল যে, খাদ্যসংগ্রহ ভালো করে হবে না বা ভালো করে করা হবে না। তাই সাত তাড়াতাড়ি গম আমদানির সিদ্ধান্ত করা হ'ল। অর্থাৎ আমদানিটি পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার। এজন্যই পরিস্থিতি বিচার করা ও আমদানির অনুমোদনের প্রকৃত অথরিটি 'ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার'-এ এই বিষয়টাকে পেশ করে আলোচনা করাই হয়নি। (সূত্র ঃ ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি)। ঘাটতির প্রশ্নে একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় ব্যাপারও আছে। কৃষিমন্ত্রক শুরুতে বলেছিল, গম উৎপাদন হবে ৭ কোটি ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ১২ মে কৃষিমন্ত্রক বলে, গম উৎপাদন হবে ৭ কোটি ১০ লক্ষ টন। চারদিন পরে ১৬ মে আবার সে হিসাব সংশোধন করে বলা হল — গম উৎপাদন হবে ৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টন। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক এমনি করেই ভারতের ঘাটতি কত হবে দফায় দফায় পরামর্শ দিয়েছে মার্কিন কৃষিদপ্তর। দু'পক্ষের হিসাবের মিলটা লক্ষণীয়। মার্কিন কৃষিদপ্তর বলে, অস্ট্রেলিয়া থেকে ৫ লক্ষ টন গম আমদানি করা সত্ত্বেও ভারতে গমের ঘাটতি হবে ৩৫ লক্ষ টন। ভারত সরকার ৮ লক্ষ টন গম আনার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করল ৮ মে'র টেন্ডারে। তারপর ১২ জুন আরও ২২ লক্ষ টন আমদানির ব্যবস্থা করা হল। মার্কিন কর্তারা আবার বললেন, ভারতের ঘাটতি থাকবে ৩৫ নয়, ৪৫ লক্ষ টন। তাই আরও ১০ লক্ষ টন আমদানি করা দরকার ভারতের। ভারতের কৃষিদপ্তর ও মার্কিন কৃষিদপ্তরের দফায় দফায় ঘাটতির হিসাব বদলে গেল কেন? একটা গোপন বোঝাপড়ার সঙ্গে মার্কিন লবির চাপও যে আছেই তা অস্বীকার করার উপায় থাকছে না। ঘাটতির পরিমাণের হিসাব নিয়ে তাই একটা কারচুপির অবকাশ থাকছেই। সন্দেহ হবেই, আমদানির অজুহাত তৈরিই ঘাটতির হিসাবের লক্ষ্য। কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষিবিপণন মহলের হিসাব ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনের কম গম উৎপাদন কিছুতেই হবে না। খাদ্যশস্যের চাষের জমির পরিমাণ সাধারণভাবে কমলেও এবার কিন্তু ৪ লক্ষ হেক্টর বেশি জমিতে গম হয়েছে। (সূত্র ঃ গণশক্তি, ২ জুলাই)

(চলবে)

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06
R. No 5268 / 60

ছাত্র রাজনীতিতে হিংসা আনল কারা

ছয়ের পাতার পর

পারছে না তার জন্য কি শাসকদলের রাজনীতি দায়ী নয়?

কেউ কেউ বলছেন, রাজনীতি থেকে ছাত্রদের দূরে রাখতে হবে। আমাদের দেশের যাঁরা বড় মানুষ, মনীষী, যাঁরা দেশের কথা, সমাজের ও মানুষের কথা চিন্তা করেছেন, তাঁরা কোনও দিন এই অভিমত দেননি, বরং বিপরীত কথা বলে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। রাজনীতি মানে কী? দেশের, সমাজের, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা চিন্তা করা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য অবিচার-অত্যাচারের পরিস্থিতি বদল করার স্বপ্ন দেখা, তার বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা ও তাকে রূপায়িত করার জন্য কাজ করা — এরই নাম তো রাজনীতি করা। ছাত্ররা এসব জিনিস ভাববে না, করবে না? দেশের সম্পদ লুঠ করে, শ্রমজীবী জনগণের রক্ত নিংড়ে এদেশের যে পুঁজিপতিরা মুনাফার পাহাড় বানিয়েছে, রাজনীতি কেবল তারাই করবে? লোকসভা বিধানসভায় যারা 'জনপ্রতিনিধি'র তকমা এঁটে দেশের ও বিদেশের পুঁজিপতিদের পদলেহন করছে, জনগণের টাকায় নিজেদের জন্য বেতন-ভাতা বিপুল হারে বাড়িয়ে নিয়ে আখের গোছাচ্ছে, রাজনীতি করার একচেটিয়া অধিকার কেবল তাদেরই থাকবে? সরকারি দলগুলোর ভণ্ড 'দেশপ্রেমিক' নেতারা দেশকে রসাতলে নিয়ে যাবে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াবার অধিকার ছাত্রদের থাকবে না? ছাত্ররাই যদি দেশের ভবিষ্যৎ হয়, তবে বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে সেই ভবিষ্যতের কথা ছাত্রাবস্থাতেই তো তাদের ভাবতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী কাজও করতে হবে। এটাই তো রাজনীতি করা। রাজনীতিতে সর্বদাই আপাত অর্থে অনেক পক্ষ ছিল, আজও আছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ, এদেশের ছাত্র-যুবকদের উদ্দেশ করে দেখিয়েছেন, বাইরে থেকে দেখলে রাজনীতিতে অনেক পক্ষ মনে হলেও আসলে রাজনীতি সেখানে দুটো — একটা বিপ্লবের রাজনীতি অপরটা বিপ্লববিরোধিতার রাজনীতি। ছাত্ররাজনীতিতে নীচতা, কাপুরুষতা, অপসংস্কৃতি, হিংসার চর্চা যারা করছে, তাদের রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে, সেটা কায়েমী স্বার্থের রাজনীতি, নতুন সমাজ গড়ার, দেশের সার্বিক কল্যাণ ঘটানোর রাজনীতি নয়। অপরদিকে, এ আই ডি এস ও'র মতো ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের সুস্থ, সভ্য, রুচিসম্মত ও নৈতিক আচার-আচরণই বুঝিয়ে দেবে তারা নতুন সমাজ আনার লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করছে। এই দুটো রাজনীতিই থাকবে। ছাত্রসমাজই স্থির করবে — কোন্ রাজনীতি তারা গ্রহণ করবে। যারা এই সিদ্ধান্তটা ছাত্রসমাজের নিজস্ব বিচার বিবেচনার উপর ছেড়ে না দিয়ে গায়ের জোরে নিজেদের মত চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই আসল অপরাধী। এদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে, এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ডাক না দিয়ে যাঁরা কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিকেই নিষিদ্ধ করার, ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করার ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা বলছেন, তাঁরা বোধ হয় রোগের উপসর্গকেই রোগ ভেবে ভুল করছেন। এই ভুলের পরিণাম সমগ্র দেশের পক্ষেই মারাত্মক হতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই আইন আদালতে প্রভাব খাটিয়ে দেশের শাসকশ্রেণী যেভাবে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন নিষিদ্ধ করিয়েছে, সেটা যদি সব রাজ্যেই তারা করতে পারে, তবে রাজনীতির অঙ্গনটা কেবলমাত্র শয়তানি রাজনীতির দখলেই চলে যাবে। ফলে, সৌমিক বসুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় যাঁরা আঘাত পেয়েছেন, তাঁদের দুঃখ শোকের সুযোগ যাতে শাসক শোষকশ্রেণী নিতে না পারে সে বিষয়ে তাঁরা সতর্ক হবেন, এই আবেদন করে বলব — আসুন আমরা সবাই মিলে আওয়াজ তুলি — কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

লেবাননে ইজরায়েলি আক্রমণ

পাঁচের পাতার পর

১৯ মার্চ ১৯৭৮, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৪২৫ নম্বর প্রস্তাব পাশ হয়। বলা হয়, ইজরায়েলকে লেবাননের দখলিকৃত জমি ছাড়তে হবে। ইজরায়েল কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাব মানেনি। এখনও পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হওয়া এরকম আরও ৬০টি প্রস্তাব মানেনি। এজন্য অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনও অর্থনৈতিক বা অন্য অবরোধ জারি করা হয়নি। কারণ, তাদের পিছনে মদত জোগাচ্ছে আমেরিকা। তাদের সমর্থনেই ইজরায়েল হাজার নিন্দনীয় কাজ করে চলেছে, আন্তর্জাতিক সমস্ত নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে সরাসরি আক্রমণ বা সামরিক অভিযান, অন্যের এলাকা দখল করে রাখা, গণহত্যা প্রভৃতি চালাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ কার্যত নীরব। নিছক উদ্বেগ প্রকাশ বা নিষ্ফল নজরদারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছে নানা আন্তর্জাতিক উদ্যোগ।

ফলে ১৯৭৮ সালে দখল করা লেবাননের অঞ্চল ইজরায়েল তো ছাড়লই না, বরং ১৯৮২ সালে আরও ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ লেবাননই দখল করে নিল। ১৯৮৭ সালে প্যালেস্তাইনের মুক্তির লক্ষ্যে পিএলও-র নেতৃত্বে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে শুরু হল প্যালেস্তাইন মুক্তিআন্দোলনের এক নতুন পর্যায় — 'ইন্তিফাদা'। নতুন পর্যায়ের এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্যালেস্তিনীয়দের মনে ব্যাপক সাড়া ফেলল। পিএলও-র নেতৃত্বে দীর্ঘদিন প্যালেস্তিনীয় জনগণের ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে যে আন্দোলন চলছিল, আমাদের দল দেখিয়েছে, সোভিয়েত সংশোধনবাদ তাকে সমর্থন করলেও, লড়াই চালিয়ে যাওয়া ও তা বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার মতো শক্তি জোগায়নি। তৎসত্ত্বেও আন্দোলন জারি ছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর মার্কিন-ইজরায়েল সামরিক চক্র, পিএলও-র গণআন্দোলনের কোমর ভেঙে দেয় এবং প্যালেস্তিনীয় জনগণের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে মধ্যপ্রাচ্যে তথাকথিত অসম 'শান্তিচুক্তি' চাপিয়ে দেয়। পিএলও-কে সীমিত ক্ষমতা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কৌশলে পিএলও-কে দিয়েই প্যালেস্তিনীয় জনগণের লড়াই দমন করানোর অপচেষ্টা চালায়। এর পরিণাম যা হওয়ার তাই হয়। প্যালেস্তিনীয় জনগণের আন্দোলন নতুন উদ্যমে গড়ে ওঠে। কিন্তু এই আন্দোলন ও দক্ষিণ লেবাননকে ইজরায়েলের দখলদারির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য পরিচালিত আন্দোলনকেই সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিয়ে তা দমন করার অজুহাতে আমেরিকার মদতে ইজরায়েল শুরু করল নতুন করে আক্রমণ। ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালে দু-দুবার প্রবল সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তারা দক্ষিণ লেবাননে তাদের দখলদারির সীমা আরও বাড়িয়ে নেয়। দাঙ্গাদীর্ণ উত্তর লেবাননে শান্তিরক্ষার জন্য উপস্থিত সিরিয় বাহিনীর উপস্থিতি বা তার অতিরঞ্জিত আশঙ্কাকে এক্ষেত্রে ইজরায়েল অনেক সময়েই অজুহাত হিসেবে হাজির করেছে।

(চলবে)

কোক-পেপসি'র সমর্থনে সিপিএমের যুক্তি হাস্যকর

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"মারাত্মক কীটনাশকযুক্ত কোক-পেপসি কেরালার মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য নয় — এই হাস্যকর বক্তব্যের দ্বারাই সিপিএম রাজ্য সম্পাদক আবার বুঝিয়ে দিলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কৃপালাভের জন্য তাঁরা যেকোন স্তরে নামতে পারেন, এমনকী এজন্য জনগণের স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি ডেকে আনতেও তাঁদের দ্বিধা নেই।

সিপিএমের এই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি তোষণকারী ভূমিকাকে ধিক্কার জানাবার জন্য রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন করছি।"

শহীদ ক্ষুদিরাম বিপ্লবী, সন্ত্রাসবাদী নন

এন সি ই আর টি'র পাঠ্যপুস্তকে শহীদ ক্ষুদিরাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান যোদ্ধাদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯ আগস্ট কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে এ আই ডি এস ও'র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ

কৃষিতে বিদ্যুৎ বিল বয়কটের আহ্বান

১২ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কৃষিতে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করে নিয়ে ১৩৪ কোটি টাকা যে গড় মাশুল ২০০৬-০৭ বর্ষে কমেছে সেই টাকা দিয়ে কৃষিতে ৫০ পয়সা ইউনিটে, ক্ষুদ্রশিল্প ও গৃহস্থকে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সি ই এস সি এলাকায় লোডশেডিং, লো- ভোল্টেজ, জোর করে বর্ধিত সিকিউরিটি আদায় এবং ডি সি গ্রাহকদের যে হয়রানি চলছে তা বন্ধ করে আইন অনুযায়ী গ্রাহকদের যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা তা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ চুরির নামে কোন প্রমাণ ছাড়াই গ্রাহকদের লাইন কেটে দিয়ে যে ফাইন করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে প্রমাণ ছাড়া সি ই এস সি'র এই স্বৈরাচারী আক্রমণ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বিশ্বায়নের কর্তাদের খুশী করতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকের বিদ্যুৎ মাশুল বাড়িয়ে সেই টাকায় বহুজাতিক বৃহৎ শিল্পপতিদের বিদ্যুতের দাম কমাচ্ছে। তার ফলে রাজ্যের কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্প সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এরকম চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের গ্রাহকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।

লাইসেন্সি, কমিশন ও সরকারের মধ্যে গড়ে ওঠা অশুভচক্র এই কাজ করে চলেছে। সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় কৃষিগ্রাহকদের আগস্ট মাস থেকে বিল বয়কট এবং বর্ধিত বিল ফেরৎ আন্দোলন চলবে। ২৯ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে ৫ লক্ষ গ্রাহকের গণস্বাক্ষর জমা দিয়ে প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ, আইনঅমান্য, অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচিতে হাজার হাজার গ্রাহক সামিল হবেন। তাতে সরকার সাড়া না দিলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠবে রাজ্যজুড়ে।

৪ সেপ্টেম্বর

চটশিল্পে সাধারণ ধর্মঘট

সফল করুন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

৭ সেপ্টেম্বর

গণ আইন অমান্য

জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, বেলা ১টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in